Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 471–477
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটকে মন্বন্তর ও নবজীবনে উত্তরণ

প্রিয়াঙ্কা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী (স্নাতকোত্তর)
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : priyankaray703@gmail.com

Keyword
নবান্ন, মন্বন্তর, মহামারী, মহাযুদ্ধ, গণনাট্য, দোসর, ফ্যাসীবাদ, দুর্ভিক্ষ, আন্দোলন, উত্তরণ

Abstract
বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত গণনাট্যের অন্যতম পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটকটি বাংলা গণনাট্য আন্দোলনকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ১৩৫০ এর মন্বন্তর বাঙালীর জীবনের একটি কালো অভিশাপের মতোই নেমে এসেছিল। মন্বন্তরের দোসর অবশ্যম্ভাবীরুপে দেখা দেয় মহামারী। মানুষের মন বিষিয়ে ওঠে। এই মন্বন্তরের পরিবেশে বিজন ভট্টাচার্য্য রচনা করেন 'নবান্ন', 'আগুন', 'জবানবন্দি' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক। আমার আলোচ্য প্রবন্ধটি হল– "নবান্ন নাটকে মন্বন্তর ও নবজীবনে উত্তরণ"। ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পিসংঘের একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক নাট্যবিভাগ হল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এই গণনাট্য সঙ্ঘের পথপ্রদর্শক। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রগতিমূলক নাট্যসংস্থাগুলিকে একটি সাধারন কর্মপন্থার মধ্যে একত্রিত করা এবং স্তিমিত প্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রানবন্ত করে তোলা জনগণের মধ্যে। এই ভারতীয় গণনাট্যের প্রযোজনায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গমঞ্চে 'নবান্ন' নাটকটি অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন শম্ভুমিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্য্য। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বিভীষিকা বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল এবং তাঁর এক বৎসর আগে হয়েছিল ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ মিলিটারির নির্মম অত্যাচার দেশবাসীর ওপর নেমে এসছিল। এছাড়া ভয়ঙ্কর সাইক্লোন এবং বন্যা গ্রাম বাংলার উপান্ত অঞ্চলকে বিপর্যস্ত করেছিল ।ব্রিটিশের তৈরি 'পোড়ামাটি' নীতির ফলে প্রচুর খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ও উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে গ্রাম বাংলার কৃষকশ্রেনী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে বাধ্য হয়। এই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের নামান্তর হিসেবেই বিজন ভট্টাচার্য্য রচনা করেণ "নবান্ন" নাটকটি। মোট চারটি অঙ্ক ও পনেরোটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকটি। গ্রাম বাংলার উদাহরণ স্বরুপ রয়েছে আমিনপুর গ্রাম। নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্যে রয়েছে গ্রাম ও শহরের মর্মান্তিক রূপ। গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে দয়াল, প্রধান সমাদ্দার ও তার পরিবারের ভিটেমাটি ছাড়ার দৃশ্য এবং পরে নিরঞ্জনের প্রতিবাদী সত্ত্বা। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যে রয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকের নতুন ভাবে বেঁচে ওঠার কাহিনি এবং তাদের নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠা। এই হিসেবে 'নবান্ন' নামকরণ অবশ্যই সার্থক। এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমে মন্বন্তরের বিভীষিকাময়রুপ এবং প্রতিবাদ ও প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষের কীভাবে নবজীবনে উত্তরণ

ঘটেছে।

Discussion

বাংলার গণনাট্য আন্দোলনে যাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য্যের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাট্য জগতের ইতিহাসে চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যা ও বাস্তবতা নিয়ে যারা নাটক রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাট্যকার বিজন ভাট্টাচার্য্য। তবে কেবলমাত্র রচনা নয় অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। নাট্যকার বিজন ভাট্টাচার্য্যের জন্ম **১৯১৫** খ্রীষ্টাব্দের **১৭ই** জুলাই অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে। ক্ষীরোদবিহারী ও সুবর্ণপ্রভা দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান বিজন ভাট্টাচার্য্য বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। গ্রামীন পরিবেশ ও শিক্ষক পিতার জীবনাদর্শে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন। এছাড়া নিজের জীবনাধারা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর নাট্যকার জীবন।

বিজন ভাট্টাচার্য্য রচিত 'নবান্ন' নাটকটি প্রকাশ পায় **১৯৪৩** খ্রীষ্টাব্দে অরণি পত্রিকায়। নাটকটি প্রযোজিত করে 'ভারতীয় গননাট্য সঙ্ঘ', **১৯৪৪** খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গমঞ্চে। ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে বাংলায় গণনাট্যের সৃষ্টি হয়। গণনাট্য আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত 'নবান্ন' নাটকে লেখক **১৩৫০** সালের মন্বন্তরের ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরেছেন। তবে এই মন্বন্তরের মধ্যেই লেখকের লেখা থেমে থাকে নি, তা থেকে উত্তরণের পথও তিনি দেখিয়েছেন এই নাটকে। এই 'নবান্ন' নাটকটি চারটি অঙ্কে মোট পনেরোটি দৃশ্যে বিভক্ত।

এই নাটকে মূল চরিত্রগুলির কৃষক সমাজ থেকে গ্রহন করা হয়েছে। ব্যক্তিরূপের থেকে শ্রেনীরূপের উপস্থাপন করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনের সমস্যা ও সংকটের চেয়ে আমিনপুরের সমগ্র কৃষক সমাজ এবং ব্যঞ্জনায় দেশের সমগ্র কৃষক সমাজের সমষ্টিগত জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের রূপই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকের পরিণাম দুঃখ হাহাকারে নয়, শোষিত ও নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষের অভ্যুত্থান ও অন্তিম জয়েই নাটকের পরিণতি ঘটেছে।

১৩৫০ এর মন্বন্তর অবলম্বনেই 'নবান্ন' নাটকটির কাহিনি রচিত হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার ইতিহাসে গভীরতম ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। নাটকের বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত মন্বন্তর। আবার এই মন্বন্তরের বিপর্য্যয়েই নাটকের শেষ কথা নয়, মন্বন্তরের শেষে বেঁচেবর্তে থাকা গ্রাম বাংলার মানুষ শহর থেকে গ্রামে আবার ফিরে এসেছে নতুনভাবে, নতুন করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার শপথ নিয়েছে অর্থাৎ নবজীবনেরই উত্তরণ ঘটেছে। সমস্ত কৃষক গ্রামে ফিরে এসে আবার নতুন ভাবে বেঁচে উঠে নতুন ধান্যে নবান্ন উৎসব করেছে।

ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী লাভের পরপরেই ঘটে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বমূহুর্তে ঘটে পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই স্মস্ত মন্বন্তর বাংলাকে শ্মশান করে দিয়েছিল। চরমতম বিপর্যয়ের এই দুই মন্বন্তরের মাঝেও ঘটে গেছে অনেক ছোট ছোট দূর্ভিক্ষের বছর। বাঙালি যে নিয়ত 'মন্বন্তর' নিয়ে ঘর করে যায়, ব্রিটিশ পরাধীন ভারতে তা বার বার প্রমানিত। **১৩৫০** এর মন্বন্তর বাঙালীর জীবনে গভীর দাগ রেখে গেছে– সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল-

> "সমগ্র বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের যে ঝড় বহিয়া গেল তাহার সঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেরই তুলনা হইতে পারে। এই দুর্বিপাক বাঙলাদেশকে বিধ্বস্ত করিয়াছে ইহার আঘাতে এদেশের সমাজব্যবস্থা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। বহু গ্রাম জনহীন শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে;"[১]

মন্বন্তরের দোসর হয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয় মহামারী। দৈহিক এই যন্ত্রণার অন্তরালে ঘটে আরও কিছু। অভাব অনটন অনাহারে দুর্বিপাকে ক্ষুদার রাজ্যে পৃথিবীকে গদ্যময় করে তোলে। মানুষের সুকুমার বৃত্তি তার স্নেহ

ভালোবাসা প্রেম ইত্যকার মানবিক সম্পর্কের দিকগুলি বোবা হয়ে গিয়ে গুমরে মরে। মনুষ্যত্বের এই অপমৃত্যু মন্বন্তরের আর এক অভিশাপ। বাংলার মন্বন্তরের জন্য দায়ী যুদ্ধের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত লুণ্ঠন ও কৃষক হত্যার নীতি, বেপরোয়া চোরাকারবার ও মুজুতদারি। অর্থাৎ পঞ্চাশের এই মন্বন্তর মানুষেরই সৃষ্টি করা। এক নিঃশব্দ দুর্ভিক্ষ ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী হয়েই রয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেও ভারত যেমন খাদ্য আমদানি করেছে, তেমনি আবার খাদ্যশস্য এমন কি চালও রপ্তানি করেছে বিদেশে। যুদ্ধ ও পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারতের এই দূর্বল খাদ্যনীতি ভারসাম্য উল্টে দেয়।

১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের বিভীষিকা বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল এবং তার এক বৎসর আগে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন অগ্নিগর্ভ বিপ্লব সমস্ত দেশকে উত্তাল করে তুলেছিল। ৪২ -এর আগস্ট আন্দোলন এবং ব্রিটিশ পুলিশ মিলিটারির নির্মম অত্যাচার এদেশবাসীর ওপর নেমে এসেছিল। ৪২ -এর শেষের দিকে ভয়ঙ্কর সাইক্লোন এবং বন্যা গ্রাম বাংলার উপান্ত অঞ্চলকে বিপর্যয় করেছিল। এর সঙ্গে ছিল জাপানি আক্রমনের ভয়ে ব্রিটিশের যুদ্ধকালীন 'পোড়ামাটি' নীতি। সেই নীতির ফলে উপকূলবর্তী গ্রামবাংলার প্রচুর শস্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল এবং অজস্র নৌকা আটক কিংবা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে জাপানি হানাদারেরা সমুদ্র পথে বাংলায় প্রবেশ করলে খাদ্য ও যানবাহনের অভাব জনিত অসুবিধায় পড়ে। এইসব কারণেও প্রচুর কৃষক ও জেলে এবং খেত মজুর নানা দুর্ভোগ ও খাদ্যাভাবে ভুগছিল। এর ওপর ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা। ইংরেজ তার যুদ্ধের রসদ জোগাতে এদেশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধের ঘাটিতে পাঠাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুত ও কালোবাজারে বেশি দামে বিক্রি। মজুতদারি ও কালোবাজারিতে দেশ ছেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাইকার মহাজন ও জোতদারের দল এরা গ্রামে গ্রামে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে শহরে পাচার করতে থাকে। প্রয়োজনে কৃষকের জমি ছলে বলে কৌশলে কিনে নিয়ে তাদের নিজ ভিটা থেকে উৎখাত করে। শুধু জমি, খাদ্যশস্য, বাসনপত্র, গয়নাগাটি নয় শুরু হয় মানুষের কেনাবেচা। নারী হয়ে ওঠে সুলভ পন্য। মারী মড়ক মন্বন্তর এবং মানুষের কেনাবেচা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, ঔদাসীন্য, অবহেলা সব মিলিয়ে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তারই পরিণাম এই পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের পরিবেশে গ্রাম বাংলার একটি অঞ্চল 'আমিনপুর' সেখানকার প্রধান সমাদ্দার ও তার পরিবার এবং সেই গ্রামের কৃষক কুলের কাহিনি নিয়েই মূলত "নবান্ন" নাটকটি রচিত। তবে বোঝা যায়, এ নাটক শুধু বিশেষ একটি অঞ্চল আমিনপুরের কাহিনি নয়, সমকালীন পরিবেশ ও পঠভূমিকায় গ্রামবাংলার দুর্দশাগ্রস্থ, পীড়িত সব কৃষকের জীবনের কাহিনি। তবে মন্বন্তরের দ্বিবিধ কারণ রয়েছে নাটকটিতে। একটি হল– প্রাকৃতিক এবং অপরটি হল– মনুষ্যঘটিত।

'নবান্ন' নাটকটি শুরু হয় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ৪২ -এর আগষ্ট আন্দোলনের আভাস। এই আন্দোলনে এবং ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়নে আমিনপুর এবং প্রধান সমাদ্দারের পরিবার বিপর্যস্থ হয়েছে। প্রধানের দুই জোয়ান পুত্র (শ্রীপতি, ভূপতি) মারা গেছে এই আন্দোলনে। প্রধান নিজে তিন মরাই ধান পুড়িয়েছে, অত্যাচারের রক্তিম পটভূমির দিকে তাকিয়ে প্রধান সমাদ্দার কুঞ্জকে বলে–

> "তা এ সব স্থির পর, সব কিছুর পর যে দিন আসবে, আমার শ্রীপতি – ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরণ হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ, ওই–ওই রকম।"[২]

এছাড়া এই দৃশ্যে প্রধানকে আমরা নির্ভীক সংগ্রামী নায়ক রূপে দেখতে পাই। প্রধানের মুখে শুনতে পাই–

> "শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রান দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রান দেব।"[৩]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধান লুকোতে বাধ্য হলেও তার অন্তর জ্বলে গেছে। ১৯৪২ সালের অভয়া সংগ্রামী নারী মাতঙ্গিনী হাজরার আভাস পাওয়া যায় পঞ্চাননীর মধ্যে। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী তার দুই পুত্রকে হারিয়েও পিছপা হয় নি। গ্রামের সকলকে প্রতিরোধে সামিল করার জন্য চেষ্টা করে। মানুষের জীবন স্বজাতি এবং মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে

না যে পুরুষরা তাদের সে ঘৃণাপুর্ন বাক্যে জর্জরিত করেছে। একটা গোটা জনতাকে পরিচালনা করে পঞ্চাননী এগিয়ে যায় শাসকের অত্যাচারের প্রতিরোধের পথে। পঞ্চাননী বলতে থাকে–

> "এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।"[৪]

এই প্রতিরোধের পথে পঞ্চাননীর মৃত্যু ঘটে, গুলিতে প্রান দিতে হয়।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই প্রধান সমাদ্দারের পারিবারিক জীবনচিত্র। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থলি, ধান বাড়ন্ত, পরিবারে খাদ্যাভাব শুরু হয়েছে। কালো জালার ভিতর যে পুরনো আউস ধান ছিল সেগুলিও শেষ হয়ে গিয়েছে। সব খুইয়ে এখন শুধু আফশোস; প্রধান বলে সব নৌকা আটক করে রাখার জন্য চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে উপকুলবর্তী সব মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্য। এই আফশোসের সুরহা নেই, এখন নতুন ধান উঠতে কয়েক মাস দেরি। কুঞ্জ স্ত্রীর মলজোড়া চায় চাল জোগাড়ের জন্য। দারিদ্র্যের আশঙ্কায় মানুষের শুভ বোধ নষ্ট হয়ে যায়দুই ভাই কুঞ্জ ও নিরঞ্জনের মধ্যে ঝগড়া বাধে। ক্রুদ্ধ কুঞ্জের কাঠের আঘাতে নিরঞ্জনের মাথা ফেটে যায়।

তৃতীয় দৃশ্যে, দেখতে পাই কুঞ্জের গৃহে দয়ালের উপস্থিতি, দয়ালও সেই দুর্ভিক্ষের শিকার। দয়ালের ঘরেও দেখা দিয়েছে অভাব অনটন। অভাবের জন্য প্রধান তার মগরার বিলের জমি বেঁচে দিয়েছে। এছাড়া বিলের ধারের বিঘে তিনেক খামার জমি আছে সেটুকু কেনাবেচা নিয়েই কথা চলছিল কুঞ্জ ও প্রধানের মধ্যে। কিন্তু দয়াল তার জমিজিরেত সব বেঁচে দিয়ে বসে আছে। এর পর এদের মুখেও উঠে এসেছে শহরে গিয়ে প্রান বাঁচাবার কথা; কুঞ্জ বলে প্রধানকে –

> "তা সে তুমি শহরেই বল আর নরকেই বল, পথ ওই এক। সরা হাতে করে গুষ্টিশুদ্ধ পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে।"[৫]

দয়াল বলে –

> "বলি শেষ পর্যন্ত এও চোখ চেয়ে দেখতে হবে। অদেষ্ট, সব অদেষ্ট।"[৬]

এর পরেই শুরু হয় মন্বন্তরের আর এক কারণ– সেটি হল প্রাকৃতিক কারণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ঝটকায় এবার সেই পথই উঠে এল ঘরে। প্রলঙ্কারী ঝড় ও বন্যা নেমে এলো গ্রামের বুকে। ঝড়ের তান্ডবে সব বাড়িঘর, গাছপালা, জন্তু –জানোয়ার তছনছ হয়ে শেষ হয়ে গেলো। প্রধানের বাড়ীর লোক আহত হল, তাদের বাড়িঘর ভেঙে যায়। প্রধান বলে –

> "পথই ঘরে উঠে এলো, ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল।"[৭]

দয়ালের পরিবারের সকলেই মারা যায় ঝড়ে। বাড়িঘর ভেঙে যায় সকলেরই। অভাব অনটনের ভেতর এক নতুন বিপদের মুখে পড়ে সকলেই দিশেহারা হয়ে পড়ে।

চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায়– এই জীর্ণগৃহ পরিবেশে– দুর্ভিক্ষে অভাবের দিনে প্রধানের পরিবারের কোনোরকম দিন গুজরাণ। জগডুমুর, কচুর লতা, শাকপাতা ইত্যাদি অখাদ্য–কুখাদ্য খেয়ে দিন যাপন করে। খানাখন্দ খুজে খুজে কাঁকড়া ধরে আনে প্রধান। কুঞ্জর অসুস্থ ছেলে মাখন খাবার বায়না ধরে। তার জন্যে এই কাঁকড়া রেঁধে দিতে বলে প্রধান। কিন্তু কুঞ্জ মাখনকে এই কাঁকড়া দিতে বারণ করে। রাগের মাথায় কুঞ্জ তার কষ্ট করে আনা কাওনের চাল ছড়িয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেলে। প্রধান অভিমানে নিজেকে আঘাত করে। প্রধান বুঝতে পারে মাখনের যে অসুখ তা হল দীর্ঘদিন না খাওয়ার ফলেই।

পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে– গ্রামের জোতদার হারুদত্ত প্রধান সমাদ্দারের বাড়িতে। গ্রামীন মানুষের দুর্দশার সুযোগে অল্পদামে জমি কিনে নিতে থাকে। প্রধানেরও জমি সে কিনে নিতে চায় অল্প দাম দিয়ে। কিন্তু কুঞ্জ আপত্তি করায় প্রধান আর জমি বেচতে রাজি হয় না। এমনকি কুঞ্জ যে ঘাস কেটে আনে সেই ঘাসেরও দাম ধরিয়ে দেয় হারুদত্ত কুঞ্জকে। কুঞ্জ জমি বেচতে রাজি না হওয়ায় হারুদত্ত তার সাগরেদদের ডেকে আনে কুঞ্জকে শায়েস্তা করতে। লাঠির আঘাতে আহত হয় কুঞ্জ। আহত কুঞ্জকে বাধ্য করে হারুদত্তের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে। বাধা দিতে গিয়ে প্রধান আহত হয়। এই উত্তেজনার মুহুর্তে মাখন উঠে দাড়াতে যায়। অনাহার ক্লিষ্ট শিশুপ্রান এই ধকল সহ্য করতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। মাখনের মৃত্যু হয়। আজন্মা, বন্যা, মহামারী ও কৃষকশ্রেনীর শত্রু জোতদার হারুদত্তের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রধান ও তার পরিবারের সকলে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে চলে যায়। কৃষক প্রধান ও তার পরিবার পরিশেষে শহরের ভিখিরিতে পরিনত হয়েছে।

নাটকের দ্বিতীয়, তৃতীয় অঙ্কে দেখি আমরা কলকাতা শহরের চিত্র। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কালীধন ধারার মত ব্যবসায়ীরা চোরা কারবারে চাল গুদামজাত করে। যুদ্ধের বাজারে সুযোগ বুঝে ব্ল্যাক মার্কেটে বেশি দামে চাল বিক্রি করে। পাইকার হারুদত্ত এই কাজে কালীধনের প্রধান সহায়ক। নিরঞ্জন শহরে এসে কালীধনের গুদামে কাজ নেয়। নিজের পরিচয় সে গোপন রেখে 'রাখহরি' নাম নেয়। এর পর দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি, শহরের সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা দুর্ভিক্ষের এই সুযোগ নিয়ে নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষের ছবি নিয়ে কাগজে ছাপায় এবং ছবির নাম দেয় 'বাংলার ম্যাডোনা' কিন্তু প্রধান প্রতিবাদ করে বলেছে– 'কঙ্কালের ছবির কারবার'। এই সমস্ত কাগজ ফটোগ্রাফাররা বেশি দামে বিক্রি করে। এরপর দেখা যায় মেয়ে পাচারের কাহিনি। বিনোদিনীকে এনে তোলা হয় কালীধনের সেবাশ্রমে। কিন্তু তথাপি আমরা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখি যে শহরের রাজপথ, ধনীর আবাসভবন, আলোর রোশনাই, এই সমস্ত কিছু দর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জ্বালা আরও বাড়িয়ে দেয়। সেখানে দেখা যায়, বিয়ে বাড়ির ফেলে দেওয়া খাবারের জন্য কুকুরের সঙ্গে মানুষের লড়াই। শেষ পর্যন্ত কুকুর কুঞ্জের হাত কামড়ে দেয়। মনুষ্যত্বহীন মানুষের উদ্দেশ্যে প্রধান দুঃখের সঙ্গে বলে ওঠে–

> "তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু – কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষান হয়ে গেছে বাবু!"[৮]

চতুর্থ দৃশ্যে জোতদার হারুদত্ত গ্রামের মেয়েদের নিয়ে আসে শহরে কালীধনের সেবাশ্রমে। গ্রামের মানুষ যারা ছিল অভাবে মেয়েকে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়– এই করুণ পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু পঞ্চম দৃশ্যে দেখতে পাই নিরঞ্জন থেমে থাকে নি শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়িয়েছে, ধরিয়ে দিয়েছে পুলিশের হাতে হারুদত্ত ও কালীধনের মত ব্যবসায়ীকে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়– মানুষের করুণ পরিস্থিতি নিখরচার লঙ্গরখানা ভিখিরেদের জন্য । গ্রাম থেকে চলে আসা নিঃসহায় ক্ষুদার্ত মানুষের ভীড় সেখানে, কুঞ্জ রাধিকাকেও সেখানে দেখা যায়। এই সব মানুষের ভীড়ে কলকাতার নগর জীবন তখন পুতিগন্ধময় হয়ে পড়ে। তার প্রতিকারের কোন উপায় ব্রিটিশ সরকার করে নি। বরং শহরকে বাঁচাবার জন্য, এই সব মানুষের জোর করে ধরে লড়িতে তোলে শহরের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। এই ভাবে অনেক সন্তান, পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। অনেকে গ্রামে ফিরেছে। আবার নাটকে উল্লেখিত বৃদ্ধ ভিখারির মত কেউ শহরেই থেকে গেছে। কিন্তু নাটকে কুঞ্জ ও রাধিকাকে দেখা যায় পায়ে হেটে গ্রামে ফিরতে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের অবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্রে দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কবলে পীড়িত লোকদের দেখা যায়। হাসপাতালে ভালো ঔষধ না থাকায় মারা যেতে থাকে রোগী। শেষে দেখা যায় প্রধানকে হাসপাতালে উন্মাদ অবস্থায়। ডাক্তার ও নার্সরা দুর্ভিক্ষ কবলিত নিঃস্ব শহর মুখে ধেয়ে আসা এই গ্রামীন মানুষগুলির অসুখ ও ব্যথা বুঝতে পারে। এদের পাগলামিও যে রোগের নামান্তর তাও বুঝতে পারে। কিন্তু যেটা বুঝতে পারে না,

সেটা হল– গ্রাম ছেড়ে আসা প্রধানদের বুকের মধ্যে যে ব্যাথা সংগোপনে রয়েছে। প্রিয়জন ও প্রিয়স্থল হারানোর যে ব্যথা মর্মমূলে রয়ে গেছে তার সন্ধান কে করবে। ডাক্তারি শাস্ত্রে তার সন্ধান নেই। এ ব্যথা প্রধানরাই বুঝতে পারে। স্বজন হারানো গ্রাম ছাড়া চাষীদের মর্মজ্বালা নাট্যকার সুন্দরভাবে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই দেখি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের নতুনভাবে বেঁচে ওঠার কাহিণী। ছিন্নমূল গ্রামবাসি আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ধান কেটে ঘরে তুলেছে। সবাই মিলে 'গাঁতায় খেটে' বেঁচে ওঠবার জন্য নতুন জীবন শুরু করেছে। বিজন ভট্টাচার্য্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তাই তাঁর মধ্যে সংঘবদ্ধ জনশক্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি নাটকটি গড়ে তুলেছেন। মানুষ সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় কৃষকরা সকলে নতুন ধান ঘরে তুলেছে। বিপদের দিনের জন্য ধর্মগোলায় ভাগের ধান সঞ্চিত করে রেখেছে। কুঞ্জ, নিরঞ্জন, রাধিকা, বিনোদিনী'র মুখে ফুটে ওঠে নতুন ভাবে বাঁচার আনন্দ। সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ যদি সমস্যার মোকাবিলায় নামে তবে উপায় হবেই। জাতপাতের ভেদাভেদ ভূলে, হিন্দু–মুসলমান সমস্ত চাষীকে লেখক একত্র হতে বলেছেন। তাই ফকিরের কণ্ঠে শুনতে পাই,

> "আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
> হিন্দু–মুসলিম যতেক চাষি দোস্তালি পাতান।।"[৯]

নাটকের শেষ দৃশ্যে অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্কের ত্রিতীয় দৃশ্যে দেখি– 'নবান্ন' উৎসব। এই উৎসব অনুযায়ী নাটকের নামকরণ হয়েছে। উৎসবের মত্ততার মধ্যে মন্বন্তরের বিভীষিকা, মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট শ্মশানের হাহাকার, জোতদার, মহাজনদের নির্মম রক্তশোষন সব কিছুর স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। উৎসবে মেতে ওঠে সমস্ত চাষী। প্রচণ্ড একটা উন্মাদনার মধ্যে কৃষক জীবনের প্রানবন্যা অবারিত ধারায় ছুটে চলেছে এই নবান্ন উৎসবে। এতোবড়ো দুর্যোগের পর এই সব কৃষক শ্রেনী আবার নতুন ভাবে জীবনের আস্বাদ পায় তাদের আনন্দে ও উৎসবে। শেষ পর্যন্ত প্রধানও ঘরে ফিরে আসে সঙ্ঘবদ্ধ জনতাকে মন্বন্তর আর এত সহজে ছুতে পারবে না। দয়ালের কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই–

> "যে গতবারের মত আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন ,আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না।"[১০]

মন্বন্তর এই নাটকের শেষ কথা নয়, মন্বন্তর থেকে উত্তরণই হল– 'নবান্ন' নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্য্য তাঁর নাটকের পরিনাম দেখিয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তির অভ্যুত্থানে, জয়ে, আনন্দে, নবজীবনের শপথ উচ্চারনের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে। মন্বন্তরে বাঙালী মরেনি, নতুন করে বেঁচে ওঠার প্রবর্তনা দেখানো হয়েছে নাটকে। 'নবান্ন' নাটক বাংলার জনমনে নানা কার্যকারণের নতুন জীবনবোধ জাগ্রত করেছে। মানুষকে নতুন ভাবে বেঁচে ওঠার মন্ত্রনা দিয়েছে। মন্বন্তরের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নাটকের শেষ হয় না, পড়ে পড়ে মার খাওয়াতেই জীবনের সব কিছু ফুরিয়ে যায় না। নতুন করে বেঁচে ওঠার শপথ নিয়ে আগামী দিনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ জনতা ও গণশক্তির উপর ভরসা রেখেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মানুষ নবজীবনের সাক্ষাৎ পেয়েছে। শ্রেনীচেতনা, শ্রেনীশত্রুদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত শ্রেনী সচেতন এই নাটকে দেখা যায়। অতএব, বিজন ভট্টাচার্য্য 'নবান্ন' নাটকে মন্বন্তরের কাহিনি ফুটিয়ে তুললেও সেই মন্বন্তর থেকে নবজীবনে উত্তরণের পথও তিনি দেখিয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধ গণশক্তির মধ্য দিয়ে।

তথ্যসুত্র :

১. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্যের নবান্ন : পূনর্মূল্যায়নঃ, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা– ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১লা জুন, ২০০৮, পৃ. ৬৪
২. ভট্টাচার্য্য, বিজন, 'নবান্ন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, দশম সংস্করণ, জুলাই, ২০১৮, শ্রাবণ,

১৪২৫, পৃ. ৩৩

৩. তদেব, পৃ. ৩৩

৪. তদেব, পৃ. ৩৮

৫. তদেব, পৃ. ৪৭

৬. তদেব, পৃ. ৪৭

৭. তদেব, পৃ. ৪৯

৮. তদেব, পৃ. ৭৭

৯. তদেব, পৃ. ১১২

১০. তদেব, পৃ. ১১৯